সুবাসটুকু নিয়ো

আহমাদ সাব্বির

রাইয়ান প্রকাশন

সুবাসটুকু নিয়ো

প্রথম প্রকাশ

জানুয়ারি : ২০২৩

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত

ইমেইল

raiyaanprokashon@gmail.com

বইমেলা পরিবেশক

নহলী

প্রচ্ছদ

আহমাদুল্লাহ ইকরাম

অঙ্গসজ্জা

সাবেত চৌধুরী

মুদ্রিত মূল্য

২৮০/- টাকা

Shubashtoko Niyo

Published by : Raiyaan Prokashon

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত। লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশের প্রতিলিপিকরণ, পুনর্মুদ্রণ, ফটোকপি, স্ক্যান, পিডিএফ প্রস্তুতকরণ, অন্য কোনো বই, ম্যাগাজিন, পত্রিকায় প্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে দা'য়াহর স্বার্থে গ্রন্থের কোনো অংশ ব্যবহার করতে চাইলে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা জরুরি। উপরোক্ত শর্তাবলীর লঙ্ঘন শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে অবৈধ।

উৎসর্গ
ইমরান রাইহান-কে
...বিনা কারণে

লেখকের কথা

আমাদের দাওয়াত ও তাবলীগ এবং খানকার মেহনতে এমন একটা প্রাকটিস দেখতে পাওয়া যায়: সাধারণ একজন মানুষ, দীনের ব্যাপারে সামান্যই কিছু জেনেছে মাত্র; কিন্তু তাকেই সবার সামনে দাড় করিয়ে দেয়া হয় নসীহার জন্য। এ কদিনে যতটুকু শিখেছে ততটুকুই সবাইকে শোনানোর জন্য। অথচ সে নিজেই সংশোধিত নয়। নিজেই সে এখনও প্রস্তুত নয়। এখানে মূলত উদ্দেশ্য থাকে, সবার সামনে উচ্চারণের মাধ্যমে কথাগুলো বক্তার অভ্যন্তরেই প্রবেশ করানো। বক্তার অন্তরেই কথাগুলো গেঁথে দেয়া। এবং এমনও হয় যে, চক্ষু লজ্জার খাতিরে হলেও বক্তা তার নিজের উচ্চারিত নসীহার উপর আমল করতে আরম্ভ করে।

তাবলিগে বিশেষ করে এটা দেখা যায় যে, একজন নতুন মানুষ সন্ধ্যায় তার জীবনের প্রথম বয়ান করলো। কিন্তু বয়ানের পর থেকেই তার মধ্যে বেশ বড় ধরণের পরিবর্তন দেখা যেতে থাকে। এশার পরের তালিমে, কিংবা রাতের খাবারের দস্তরখানে তাকে নতুনভাবে আবিষ্কার করা যায়। অথচ আজ সন্ধ্যার বয়ানের পূর্বেও সে হয়তো এতটা বিনয়ী কিংবা সুশৃঙ্খল ছিলো না। অন্যকে দেখানোর জন্য হলেও সে তারই বয়ানের উপর আমল করতে শুরু করে দিয়েছে। এতে ক্ষতি কিছু নেই। আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় মাওলানা আশরাফ আলী থানবি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে হলেও আমল শুরু করে দাও। এই আমল তোমার থেকে এক সময় রিয়া (লোক দেখানোর মানসিকতা) দূর করে দেবে।

'সুবাসটুকু নিয়ো' তেমনই এক উদ্যোগ। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে আমি নসীহামূলক কিছু গদ্য লিখেছিলাম। উদ্দেশ্য ছিলো নিজেকেই সতর্ক করা। এবং টের পাই, আমি তাতে ঠকিনি। উপকৃতই হয়েছি। বন্ধুদের অনুরোধে, বিশেষ করে রাইয়ান প্রকাশনীর প্রকাশক ভাইয়ের পরামর্শে গদ্যগুলো আরও খানিক পরিমার্জন শেষে এবং নতুন করে আরও বেশ কিছু রচনা প্রস্তুত করে আপনাদের জন্য এই গদ্যের বইটি সাজিয়েছি। আশা করি, পাঠকের উপকারই হবে। কারণ, উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে।[১]

[১] সুরা যারিয়াত, আয়াত: ৫৫

এখানে একটি কথা বলে নেয়া খুবই জরুরী বোধ করছি। যে কোনো রচনাই যে কারুর জন্য নয়। প্রতিটি রচনারই উদ্দিষ্ট পাঠক থাকে। 'সুবাস্টুকু নিয়ো'র ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। খুবই সত্য। উদ্দিষ্ট পাঠকের হাতে বইটি পৌঁছে গেলেই শ্রম সার্থক হবে মনে করি। যারা বইটি পাঠকের হাতে পৌঁছে দিতে শ্রম, মেধা ও সময় ব্যয় করেছেন তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ আপনাদের সবার ভালো করুন।

দোয়া করি–আল্লাহ আমাদের সবার হৃদয়কে নসীহা গ্রহণের জন্য কবুল করে নিন। লেখক, প্রকাশক এবং পাঠককে এর যা কিছু কল্যাণকর নিজেদের জীবনে বাস্তবায়নের তাওফিক দান করুন। 'সুবাস্টুকু নিয়ো'র পরশে আমাদের সবার জীবন হয়ে উঠুক হাসনাহেনার মতো সুবাসিত, গন্ধময়।

আহমাদ সাব্বির

ahmedsabbir7422@gmail.com

সূচিপত্র

সুস্থ বীজ, পরিপুষ্ট ফসল ১১
দীনকে খাঁটি করুন..... ১৪
অনিঃশেষ অন্ধকার..... ১৭
সাল্লি আলা মুহাম্মাদ..... ১৯
স্মারক..... ২২
হক-না হকের ফিরিস্তি ২৪
ঝরে যায় বকুলের ঘ্রাণ ২৬
আশ্চর্য বিজনেস পলিসি ২৯
কেমন হবে রবের সাথে আমার সম্পর্ক? ৩৩
এ জীবন পুণ্য করো ৩৬
যুক্তিও যদি দিতে হয়... ..... ৩৯
হাদীসে জিবরীল: দাওয়াতের সহজ পাঠ ৪১
চলুন, পাল্টাই..... ৪৫
কোন আগুণে পুড়ছে ঘর!..... ৪৯
ভেতর-বাহির ৫২
হেথা নয়! অন্য কোথায়? ৫৬
তারকা-অসুখ কিংবা অসুখের তারকা..... ৫৮
শো-অফ বিত্তান্ত..... ৬১
জীবন যেন ইচ্ছেডানা ৬৪
তোমার ঈমানকে খাঁটি করো... ..... ৬৭
অপরাধ-পরিচয়..... ৭০
লোকে কী বলবে... ..... ৭২
মুমিনের মূলধন ৭৫
ইথারে ইথারে... ..... ৭৬
মৃত্যু এমন..... ৭৮
দায়ীর দায়..... ৮০

প্রশান্তি খুঁজে ফিরি সালাতে.....৮২
অজু: ধুয়ে ফেলে আত্মার পঙ্কিলতা যতো.....৮৪
ইসলামের মোটিভেশনাল অ্যাপ্রোচ.....৮৬
তারাদের দেখানো পথ.....৮৮
দয়াময়! রক্ষা করো...৯১
জুমআ রাতের আলাপ.....৯৩
ব্যস্ত-সমস্ত জীবনে কুরআন.....৯৬
জমিন! তুমি সাক্ষী থেকো...৯৮
মুমিন-জীবনে কুরআন.....১০০
কন্যা দায়গ্রস্ত পিতা: দায় কত আর?.....১০২
দাম্পত্য.....১০৪
মানুষ মানুষের জন্য...১০৬
অবরুদ্ধ সময়ের নাজরানা.....১০৮
আশাপ্রদ আমল.....১১১
আলোকবর্তিকার সন্ধানে.....১১৩
উট বাঁধার পরের গল্প.....১১৬
আরেকটু ভেবে দেখি.....১১৯
যুক্তি-কুযুক্তির ফাঁদ.....১২১
খুলে দাও ভাবনার দ্বার.....১২৩
ভালোবাসাবাসি.....১২৬
পরিচয়-অপরিচয়ের সীমানা ভুলে.....১২৯
অভিজ্ঞতার বয়ান.....১৩২
লাজুকলতার হাসি.....১৩৪
কে বড় জ্ঞানী?.....১৩৭
কুরআনিক মানদণ্ড.....১৩৯
বাহানা খোঁজার বাহানা.....১৪১
মিথ্যা স্বপ্ন কিংবা স্বপ্নের মিথ্যা বয়ান.....১৪৩
এ আহ্বান সকলের তরে.....১৪৭
কার প্রশ্ন কারে করি!.....১৫৩
আল্লাহ আল্লাহ বলো বান্দা...১৫৫

মুমিনের ফরিয়াদ.....১৫৮
কৃতজ্ঞতার নিগড়ে বাঁধি.....১৬০
অকারণ বকাবকি.....১৬১
কিসের এত তাড়া?.....১৬৩
হৃদয়ের কথা বলি.....১৬৬
হারিয়ে পাওয়ার সুখ.....১৬৮
বিপদের ঘনঘটা এবং আমাদের অঙ্গীকার.....১৭০
বাঁধার দেয়াল.....১৭৩
চেয়ে না পাওয়ার বৃত্তান্ত.....১৭৫
নেয়ামত নিয়ে চিন্তা.....১৮৩
আশ্রয় চাই আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে.....১৮৫
বিসমিল্লাহ বলিয়া আমি শুরু করলাম ভাই.....১৮৭
তোমার ঈমানকে খাঁটি করো.....১৮৯

সুস্থ বীজ, পরিপুষ্ট ফসল

বীজতলায় আপনি যে ফসলের বীজ বপন করবেন সেখানে সেই ফসলেরই চারাগাছ রোপিত হবে। ধান ছড়ালে ধান আর গম ছড়ালে গম। আপনি বীজতলা ভরিয়ে তোলেন যদি কোনো বিষবৃক্ষের বীজ দিয়ে তবে সেখানে গজিয়ে উঠবে সেই বিষাক্ত বীজেরই গুচ্ছ গুচ্ছ চারা গাছ।

আপনার মনের যে জমিনটা আছে তাকে কল্পনা করতে পারেন, তা যেন একখণ্ড বীজতলা। লাঙল চালিয়ে, পানি ছিটিয়ে তা নরম করে তোলা হয়েছে। এখন তাতে যে বীজ ফেলে দিবেন সেখানে বেড়ে উঠবে তারই চারাগাছ। আর ক্রমেই সেই চারাগাছ ডালপালা ছড়িয়ে হয়ে উঠবে বিশাল মহিরুহ।

ফসলী জমিতে বীজ ছড়ানোর আগে যেভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে হয়, যেভাবে নানাদিক সম্বন্ধে ভেবে নিতে হয় এবং ভেবে নেনও তদ্রুপ মনের জমিনেও বীজ ছড়াবার কালে আপনাকে ভাবনা-চিন্তা করে নিতে হবে।

আমাদের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যা বাস্তবায়িত করে তা যেন মনের জমিনে বপনকৃত বীজ থেকে অঙ্কুরিত চারা গাছ। যে কাজটি আপনি হাতের সাহায্যে করছেন, মুখে যে বাক্যটি আপনি উচ্চারণ করে উঠছেন প্রথমে তা তো হাজির হয় আপনার মাথায়, শুরুতে আপনার করোটির অন্দরে তার একটা ছায়া ভেসে ওঠে; আবছা একটা প্রতিকৃতি দেখতে পান। যাকে আমরা চিন্তা বা কর্মের ইচ্ছা বলতে পারি। প্রথমে আমাদের মনে কর্মের একটি ইচ্ছা তৈরি হয়। তারপর আমরা আমাদের সেই কল্পনাকে, সেই ইচ্ছাটিকে নানাভাবে নানা মাধ্যমে বাস্তবে রূপায়িত করে উঠি।

আমাদের কল্পিত ইচ্ছাগুলো কখনও ভালো কাজের হয়; কখনও আবার আমাদের ইচ্ছাগুলো হয়ে থাকে খুবই মন্দ। ইচ্ছা যদি ভালো হয় তবে তা যেন একটা ভালো বীজ। মনের জমিনে এটাকে বাড়তে দেয়া উচিত। এবং সবশেষে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে তার বাস্তবায়ন করাটাও কল্যাণকর।

কিন্তু আমাদের ভেতরে যদি জন্ম নেয় খারাপ কাজের কামনা তবে এটাকে মনের বীজতলায় ছড়িয়ে দিতে নেই। এটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয় দূরে। শক্ত পাথুরে কোনো

জমিনে। যেন তা থেকে অঙ্কুর গজাতে না পারে। যেন তা কর্মের আকৃতিতে আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে বাস্তবায়িত হতে না পারে।

এজন্য আল্লাহ ওয়ালা মানুষেরা বলেছেন, তোমার মনে উদিত হওয়া প্রতিটি চিন্তাকে যাচাই করে নাও।[১]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তোমার মন্দ চিন্তাকে প্রতিহত করো। যদি তা না পারো তবে তোমার চিন্তা কুপ্রবৃত্তির রূপ ধারণ করবে। মন্দ চিন্তা কুপ্রবৃত্তির রূপ ধারণ করলে তখন তার বিরুদ্ধে লড়াই করো। যদি লড়াইয়ে টিকতে না পারো তবে সেটা কিন্তু আরও শক্তি পেয়ে দৃঢ় সংকল্পে পরিণত হয়ে যাবে। এখন তুমি যদি তোমার দৃঢ় সংকল্পকে আটকাতে ব্যর্থ হও তবে তা তোমার কর্মের মধ্য দিয়ে বাস্তবে রূপায়িত হবে। এরপর কর্মের মাধ্যমে তার বাস্তবায়ন ঠেকাতে না পারলে সেই মন্দ চিন্তা, যা কর্মে পরিণত হয়েছে, তাতে তুমি অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। আর একবার মন্দ কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে তা ছেড়ে দেয়া তোমার জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে দেখা দেবে।[২]

আমরা জানি, জমিতে উৎপন্ন যে কোন আগাছাকে অঙ্কুরেই উপড়ে ফেলতে হয়। তাকে বাড়তে দিতে নেই। বাড়তে দিলে ফসলেরই ক্ষতি। তেমনি মনের মধ্যে কোনো বাজে চিন্তার ছবি ফুটে উঠলে তাকে স্থায়ী করতে নেই। দ্রুতই মুছে ফেলতে হয়। কোনো মন্দ চিন্তা ও অন্যায় কাজের চারাগাছ হৃদয়-জমিনে গজিয়ে উঠলে তার যত্ন নিতে নেই। বরং ছোটো থাকতেই, শেকড় আরও গভীরে যাবার আগেই তাকে সমূলে উপড়ে ফেলে দিতে হয়।

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের মনেও কখনও কখনও এমন অযাচিত, অনাকাঙ্খিত চিন্তা দানা বাঁধতো বটে; কিন্তু তারা সেটাকে বাড়তে দিতেন না। তার গোড়ায় পানি ঢালতেন না। বরং নবিজীর সাথে আলোচনা করে দ্রুতই সেই চিন্তাকে টেনে ছুঁড়ে ফেলতেন মনের বাইরে। হৃদয়-জমিনের অনেক দূরে।

মনের গহনে অনাকাঙ্খিত কোনো চিন্তা উদ্ভাসিত হওয়াটা মূলেই খারাপ নয়। শয়তান তো প্রতিনিয়ত আমাদের ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা দিতেই থাকে। কিন্তু চিন্তাটা বাস্তবে পরিণত করে ওঠা হলো দোষের। মনের মধ্যে কখনও মন্দ চিন্তা চলে এলে আমার কর্তব্য হবে তাকে প্রশ্রয় না দেয়া। এবং মন্দ চিন্তাটাকে মন্দ হিসাবেই বিবেচিত করা। সেটাই হবে আমার মুমিন সুলভ আচরণ।

---

[১] রিসালাতুল মুসতারশিদীন

[২] আল ফাওয়ায়েদ, পৃষ্ঠা: ৩১

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেন, একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট তাঁর কতিপয় সাহাবী এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আমাদের অন্তরে এমন কিছু অনুভব করি যা ব্যক্ত করা কিংবা মুখে উচ্চারণ করাটাকে আমরা গুরুতর মনে করি। এ ধরণের কোনো কথা আমাদের মনে উদ্ভাসিত হোক কিংবা আমাদের দ্বারা পরস্পরের সমালোচনা হোক—এটা আমরা পছন্দ করি না। এ কথা শুনে নবিজী বললেন, তোমরা কি সত্যই এরূপ অনুভব করো? (অর্থাৎ, মন্দ চিন্তা মনে চলে আসাটাকে গুরুতর মনে করো কিনা!) তারা বললেন, হ্যাঁ। তখন নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা স্পষ্ট ঈমানের লক্ষণ।[১]

এ হাদীস থেকে আমরা দিক-নির্দেশনা খুঁজে পাই। মনে কখনও মন্দ চিন্তা চলে আসলে আমাদের করণীয় কী হবে তা আমরা জেনে উঠি এই হাদীস থেকেই। আমাদের কর্তব্য হবে প্রথমত চিন্তাটাকে মন্দ হিসাবেই বিবেচনা করা। এবং তাকে প্রশ্রয় না দিয়ে মন থেকে সম্পূর্ণরূপে ঝেড়ে ফেলা। মন্দ চিন্তা জাগ্রত হওয়াটাকে নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বড় করে দেখছেন না; যদি মন্দটাকে মন্দ বিবেচনা করা হয়। তখন সেটাকে বরং তিনি ব্যক্তির ঈমান থাকার আলামত হিসাবে চিহ্নিত করছেন।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর থেকে আরেকটি বর্ণনা আছে। মনে জাগ্রত ইচ্ছা সম্বন্ধে যেখানে আমরা আরও স্পষ্ট নির্দেশনা পাই। তিনি বলছেন, নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ আমার উম্মতের হৃদয়ে যে খেয়াল জাগ্রত হয় তা ক্ষমা করে দিয়েছেন, যতক্ষণ না সে তার ওই চিন্তাটাকে কার্যে পরিণত করে বা মুখে উচ্চারণ করে।[২]

হৃদয়ের অন্দরে, মনের খুউব গভীরে কোনো ভাবনা-চিন্তার উদ্ভাস হতেই পারে। ঘটতেই পারে কোনো অনাকাঙ্খিত কিংবা অযাচিত কোনো চিন্তার উন্মেষ। তবে আমাদের চেষ্টা ও সর্বাত্মক প্রয়াস থাকবে সেই চিন্তা ও কল্পনা যেন আমাদের কথা কিংবা কাজে বাস্তবায়িত না হয়। সেটাই হবে আমাদের মুমিন সুলভ কর্তব্য।

আল্লাহ তায়ালার কাছে তাওফিক কামনা করছি।

[১] সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ৫১১১

[২] সহিহ বুখারী, হাদিস: ৫২৬৯

দীনকে খাঁটি করুন

“তিনিই আল্লাহ; তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।”[১]

ইসলামের মূল ভিত্তি স্থাপিত তাওহীদের কালিমার ওপর। তাওহীদের কালিমা অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' পাঠ করে আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের স্বীকারোক্তি প্রদান করার মধ্য দিয়েই ইসলামে প্রবেশ করতে হয়। এই কালিমার বিস্ময়কর ফলাফল হলো—কালিমাটি পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গেই একজন মানুষের জীবনে এক অভাবিত পরিবর্তন ঘটে যায়: যে ছিল আল্লাহতে অবিশ্বাসী, কালিমাটি পড়ে ওঠা মাত্রই সে হয়ে পড়ে বিশ্বাসীদের দলভুক্ত। যে ছিল আল্লাহ তায়ালার ক্রোধের পাত্র সেই হয়ে ওঠে তাঁর একান্ত প্রিয়ভাজন। যার নসীবে লেখা ছিল জাহান্নাম তার জন্য ফায়সালা করা হয় চির সুখের জান্নাত। আমার এই কথা কোন কাব্যিক অতিরঞ্জন নয়—মানুষকে জাহান্নামের তলানি থেকে উঠিয়ে মুহূর্তেই জান্নাতুল ফেরদাউসের উচ্চ আসনে সমাসীন করে যে কালিমা তা এই তাওহীদের কালিমা। আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শেষ রসুল—এই মহান কালিমাতে পূর্ণরূপে সমর্পণই মানুষের মুক্তির একমাত্র সোপান।

একত্ববাদে বিশ্বাসী যে তার কিছু আবশ্যিক কর্তব্য আছে। সে আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কারোর ওপর ভরসা রাখবে না। সকল কাজে সামনে রাখবে কেবল আল্লাহ তায়ালাকেই। আল্লাহ তায়ালার বিধান থেকে কখনও সে পলায়ন করবে না; তা বাহ্যত যতো অসম্ভবই মনে হোক না কেন! আল্লাহ ছাড়া শপথ বাক্য উচ্চারণ করবে না সে কারোর নামে। দ্বিতীয় কারোর ভয়কে তার অন্তরে জায়গা দেবে না। সে অনুতপ্ত হবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাছে। রব এবং ইলাহ হিসাবে সে হৃদয়ে স্থান দেবে না পৃথিবীর অন্য কিছুকে, অন্য কাউকে। এটাই হলো তাওহিদের কালিমার দাবী। এর বিনিময়েই জাহান্নামকে হারাম করা হবে তার জন্য।

মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু একদিন নবিজীর পেছনে বসে কোথাও যাচ্ছিলেন। নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অকস্মাৎ তার দিকে ফিরে

[১] সুরা হাশর, আয়াত: ২২

তাকালেন। তাকিয়ে বললেন, তুমি জানো বান্দার ওপর আল্লাহ তায়ালার হক কী? আর আল্লাহ তায়ালার ওপরেই বা বান্দার কী হক?

মুয়াজ বলেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলই ভালো জানেন।

নবিজী এবার বললেন, বান্দার ওপর আল্লাহ তায়ালার হক হলো সে কেবল তাঁরই ইবাদাত করবে। এবং তাঁর সাথে শরীক করবে না অন্য কাউকে। আর আল্লাহ তায়ালার ওপর বান্দার হক হলো যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না তিনি তাকে শাস্তি দিবেন না।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সব চাইতে বড় অপরাধ কী!

জবাবে নবিজী বলেছিলেন, যে আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর কোনো সমকক্ষ নির্ধারণ করা। তাঁর কোনো সমকক্ষ সাব্যস্ত করাই হলো সব চাইতে বড় অপরাধ।

আল্লাহ তায়ালা কী বলছেন দেখুন। আল্লাহ তায়ালা বলছেন, আমি প্রতিটি জাতির মধ্যে রাসুল পাঠিয়েছি। এই নির্দেশ প্রদান করে যে, তোমরা আল্লাহ তায়ালার ইবাদাত করো। আর বেঁচে থাকো তাগূত থেকে।[১]

উলামায়ে কেরাম বলেন, আল্লাহ ছাড়া আর যা কিছুরই উপাসনা করা হয় সেটাই তাগূত। আরও খানিকটা বিস্তারের সাথে বলতে চাইলে বলতে হবে, আল্লাহ ভিন্ন যাদের উপাসনা করা হয় এবং তারা উপাস্য হতে পেরে অনন্দও অনুভব করে তারাই হলো তাগূত।

আল্লাহ তায়ালা সকল রাসুল পাঠিয়েছেন এই মহান লক্ষ্যে—মানুষ যেন তাঁর সাথে কোনো কিছুর অংশীদারত্ব নির্ধারণ না করে। যেন মানুষ কাউকে তার সমকক্ষ মনে না করে। কিন্তু আমরা সেই কাজটিই ছাড়তে পারছি না। আল্লাহ তায়ালার সাথে কারোর অংশীদারত্ব সাব্যস্ত করা থেকেই নিজেদের বিরত রাখতে পারছি না।

আমরা যারা মুসলমান বলে সমাজে পরিচিত হয়তো তারা মূর্তির সামনে মাথা নত করছি না। হয়তোবা তারা আগুনের পূজা করছি না। কিন্তু শিরক থেকে কি সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাকছি! রবের বিধানের সাথে আমরা অন্যের বিধানকে মিলিয়ে ফেলছি। তাঁর সিফাতের সাথে অন্যকে অংশীদার বানিয়ে বসছি। কোনো না কোনোভাবে আজ আমরা ছোটো বড় শিরকে নিমজ্জিত। অফিসে বসে আল্লাহ তায়ালার সাথে শিরক করে আজান হলে নামাজে গিয়ে দাড়াচ্ছি। রোজা রেখে বিচারের এজলাসে বসে তাঁর

[১] সুরা নাহাল, আয়াত: ৩৬

সাথে শিরকে জড়িয়ে পড়ছি। হাদীসের মসনদে আসীন হয়েও বেঁচে থাকতে পারছি না শিরক থেকে। আবার শিরকযুক্ত এসব আমল সহই আমরা নাজাতের আশা নিয়ে দিন পার করছি। কিন্তু আমাদের কি রাব্বে কারীমের এই ফরমান জানা নেই— শিরকের কারণেই বরবাদ হয়ে যেতে পারে, মুহূর্তেই ছাই হয়ে যেতে পারে আমাদের তাবৎ আমল।[১]

বিপরীতে যদি আমি বেঁচে থাকতে পারি শিরক থেকে, রবের সাথে অংশীদরত্ব সাব্যস্ত করবার অন্যায় থেকে তাহলে? তখন আমার প্রাপ্তিটা কী হবে? হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তায়ালা বলছেন, হে আদমের সন্তান! যদি তুমি এক পৃথিবী গোনাহ নিয়েও আমার কাছে আসো, কিন্তু কোনোদিন আমার সাথে শিরক করোনি, তবে আমি এক পৃথিবী ক্ষমা নিয়ে হাজির হবো।[২]

অনেক বেশি আমল করা জরুরী নয়। সারারাত কিয়ামুল লাইলে দাঁড়িয়ে থেকে পা ফুলিয়ে ফেলা আবশ্যক নয়। কিন্তু সামান্য ও অবধারিত আমল যা করবো তা খাঁটি ও শিরকমুক্ত হওয়া জরুরী। এটাই পরম কাম্য। এই হোক আমাদের আরাধনা।

[১] দ্রষ্টব্য: সুরা আনআম- ৮৮

[২] তিরমিযী: ৩৫৪০

অনিঃশেষ অন্ধকার

'ভালো মানুষ' সাজা তো আজকাল বড় সহজ। ঝকমারি পোশাক গায়ে চাপালেই তাকে আমরা নিশ্চিন্তে 'ভালো মানুষ' বলে ধরে নেই। গায়ে ভালো পোষাক, কাপড়ে জড়ানো দামি সেন্টের মোহময় সুবাস, পায়ের যে জুতো জোড়া তা বাজারের সব চাইতে দামি দোকান থেকে কেনা—ব্যাস, আর কি দরকার! মজলিসের সব চাইতে উঁচু জায়গাটা ছেড়ে দেই তার জন্য। চলতি পথে মাথা ঝুঁকিয়ে সালাম ঠুকি তার সম্মানে। কিন্তু সে যে তার ব্যক্তিগত গাড়ি থেকে নেমে অকারণ ধমকে উঠলো তার বেতনভুক্ত চালকের উদ্দেশ্যে, অযথাই হম্বিতম্বি দেখিয়ে এলো তার বাসার দারোয়ানের সাথে এসব তার 'ভালো মানুষি'র ক্ষেত্রে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করে না। তার গাড়ির মডেল, জামার নান্দনিক বোতাম আর দামি সেন্টের নরম সুবাস আস্তর ফেলে দেয় তার তাবৎ 'অমানুষি'র ওপর।

প্রায়দিন রিক্সাওয়ালার সাথে আপনার ক্যাচাল বেঁধে যায় ভাড়া নিয়ে। দুয়েকদিন তো গায়ে পর্যন্ত হাত তুলে বসেন। সেদিন লোকাল বাসে দুইটা টাকার জন্য পিচ্চি কন্ডাক্টারের গালে কষে চড় বসিয়ে দিলেন যখন বাসসুদ্ধ মানুষ কেমন অবাক চোখে চেয়ে রইলো আপনার দিকে। তাদের চোখভরা কি ঘৃণা ছিল! হয়তোবা। কিন্তু সেসব তো আর আপনি গায়ে মাখেন না। অবশ্য কেইবা আজকাল মানুষের ক্ষোভ-ক্রোধ-ঘৃণার পরওয়া করে!

কতটুকুই আর ক্ষমতা আপনার! অতি সামান্য কিছু বিত্তই না আপনার অধিকারে এসেছে! তাতেই মাটিতে যেন পা পড়ে না! সমাজের নিচের তলার সবার দিকে তাকান অবজ্ঞার দৃষ্টিতে। পান থেকে চুন খসলেই তেড়ে যান আপনার দুর্বল অধস্তনের দিকে। এতটুকু ক্ষমতা নিয়ে জুলুমের ফর্দ খুলে বসেছেন। পাড়া-পড়শি এমনকি ঘরের লোকেরা পর্যন্ত নিস্তার পায় না আপনার অবিচার-অত্যাচার থেকে।

এ সামান্য ক্ষমতা পেয়েই এমন জালিম হয়ে উঠলেন আপনি! অথচ সবার ওপর ছড়ি ঘোরাবার ক্ষমতা রাখেন যিনি, যার ক্ষমতা ও শক্তির সামনে আমি আপনি সবাই তুচ্ছ

তিনি কী বলেছেন শুনবেন! তিনি বলছেন, বান্দা! নিজের জন্য আমি জুলুমকে হারাম করে নিয়েছি। হারাম করে দিয়েছি তোমাদের জন্যও। তোমরা জুলুম কোরো না।[১]

অথচ আপনি সিদ্ধান্তই নিয়ে রেখেছেন, জালিম হবেন। আপনার চাইতে দুর্বল যে তার ওপর নিপীড়ন চালাবেন। আবার হা হুতাশ করছেন দুনিয়া বরবাদ হয়ে গেল বলে।

পৃথিবীর সর্বত্র এই যে ধ্বংস ও নৈরাজ্য—এর মূলে কী জানেন! এর মূলে আমার আপনার জুলুম। বাড়ি-ঘর, দেশ-রাষ্ট্র-সমাজ ধ্বংস ও বিরাণ হয়ে পড়বার একটি বড় কারণ হলো জুলুম। অন্যায় ও অবিচার জনপদকে ধ্বংস করে দেয়। ইবনে খালদুনও তার মুকাদ্দিমায় বলেছেন, একটি সমৃদ্ধ শাসন ব্যবস্থা ক্রমেই ধ্বংসের দিকে ধেয়ে চলে তার জুলুমের কারণে। যে পরিবারে জুলুম চলে সেই পরিবার ধ্বংস হয়ে যাবে। যেই সমাজে জুলুম ব্যাপকতা লাভ করে বিনাশ হয়ে যায় সেই সমাজ। এভাবে ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত সব কিছুর ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে কারোর একার কিংবা সমষ্টির অন্যায় অবিচার ও জুলুমের কারণে। আল্লাহ তায়ালা বলছেন, এই তো তাদের বাড়ীঘর-তাদের জুলুমের কারণে জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। নিশ্চয় এতে রয়েছে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন।[২]

জুলুম হলো অনিঃশেষ অন্ধকার। যে অন্ধকারে একবার হারিয়ে গেলে আলোর সন্ধান খুঁজে পাওয়া বেশ শক্ত। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে জুলুমের কৃষ্ণগহ্বর থেকে রক্ষা করুন। বাঁচিয়ে রাখুন আমাদেরকে জালিম হওয়া থেকে এবং মাজলুম হওয়া থেকেও।

[১] মুসলিম ৬৪৬৯

[২] সূরা আন নামল, আয়াত: ৫২

সাল্লি আলা মুহাম্মাদ...

আল্লাহ তায়ালার পরে মুমিন হৃদয়ে অপার শ্রদ্ধা ও মুগ্ধকর ভালোবাসার আসনে যিনি আসীন তিনি আমাদের নবিজী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুহাব্বাত ও ভালোবাসা কেবল আবেগের বিষয় নয়, দ্বীন ও ঈমানের বিষয়। একজন মুমিনের হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সর্বোচ্চ আসনে যিনি বরিত—তিনি আমাদের নবীজি। তাঁর প্রতি মুমিনের এই ভালোবাসা কেবল কর্তব্য, দায়িত্ব কিংবা মানবিক বিবেচনার বিষয়ই কেবল নয়; বরং দীনের অংশ। তাঁর প্রতি একজন ব্যক্তির ভালোবাসার নিরিখেই পরিমাপিত হয় সেই ব্যক্তি কতোটা মুমিন আর কতোটা ভণ্ড!

কুরআন মাজীদের বিভিন্ন জায়গায় এ কথা বলা হয়েছে। এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—বলুন, তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন এবং ওই সম্পদ, যা তোমরা উপার্জন কর এবং ব্যবসা-বাণিজ্য—যার ক্ষতির আশঙ্কা তোমরা কর এবং ঐ ঘর-বাড়ি, যাতে তোমরা বসবাস কর, যদি তোমাদের কাছে আল্লাহর চেয়ে, তাঁর রাসূলের চেয়ে এবং তাঁর রাস্তায় জিহাদের চেয়ে অধিক প্রিয় হয়ে থাকে তাহলে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।[১]

হাদীস শরীফে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জবানিতেও এ সতর্ক বাণী উচ্চারিত হয়েছে। নবীজি বলেছেন, তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছে তার পিতা থেকে, পুত্র থেকে এবং সকল মানুষ থেকে অধিক প্রিয় না হবো।[২]

নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশের নানা উপায় ও পন্থা বর্ণিত হয়েছে কুরআন কারীম ও সুন্নাহতে। ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রকাশের যে সকল পদ্ধতি শরীয়ত আমাদের নির্দেশ করছে তার একটি হলো দুরূদ

---

[১] সূরা তাওবা : ২৪

[২] হযরত আনাস রা.-এর সূত্রে, বুখারী, কিতাবুল ঈমান, হাদীস : ১৫; মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস : ১৭৭

শরীফ পাঠ করা। আল্লাহ তায়ালা কুরআন কারীমে বলছেন, আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর জন্য রহমতের তরে দোয়া করো এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ করো।[১]

নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দুরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি দশবার রহমত নাযিল করবেন।[২]

একজন মুমিনের সব চাইতে বড় পুঁজি হলো আল্লাহ তায়ালার রহমত। আল্লাহ তায়ালার রহমত বর্ষিত হয় যার ওপর অপার শ্রাবণধারার মতোন তার আর ভাবনা কিসে! সে তো পৃথিবীর বুকে সৌভাগ্যবান একজন মানুষ। মুমিন মাত্রেই তাই কামনা করে আল্লাহ তায়ালার রহমত। নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই রহমত লাভের কত সহজ একটি উপায় বলে দিচ্ছেন—দুরূদ পাঠ। নবিজীর উপর একবার দুরূদ পাঠ করবেন তো দশবার রহমাত নেমে আসবে আপনার 'পরে। এমন নেয়মাত কি তুচ্ছ করা চলে!

আমাদের তো এখন কর্তব্য—উঠতে বসতে হারহামেশা রসনাকে সিক্ত রাখা নবজীর প্রতি দুরূদ উচ্চারণে। কত সময় আমরা বেকার বসে থাকি! জীবনের কত মুহূর্ত কেটে যায় আমার অনর্থক আলাপনে! অথচ আমি চাইলে পারতাম দুরূদ পাঠের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার রহমতকে নিজের করে নিতে।

নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দুরূদ পাঠ করবার একটি বিশেষ সময় হলো শেষ রাত। যখন বিশ্ব চরাচর নিস্তব্ধ। রাতের অন্ধকারের মতোই পৃথিবী তলিয়ে আছে ঘুমের অতলে তখন আপনি জেগে উঠুন। হৃদয়কে আপ্লুত করে তুলুন দুরূদ শরীফের একেকটি হরফের উচ্চারণে। দেখবেন—অনাবিল প্রশান্তি নেমে আসবে আপনার জীবনের অলিন্দে।

শেষরাতে দুরূদ পাঠ সম্পর্কে নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রিয় সাহাবিকে কী বলছেন চলুন শুনে আসি। ঘটনাটি আমাদেরকে জানাচ্ছেন হজরত উবাই ইবনু কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন, রাতের দুই-তৃতীয়াংশ চলে যাওয়ার পর রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘুম থেকে জেগে দাঁড়িয়ে বলতেন, হে মানব সকল! তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ কর, তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ কর। কম্পন সৃষ্টিকারী প্রথম শিঙ্গাধ্বনি এসে পড়েছে এবং এর

[১] সূরা আহযাব, আয়াত: ৫৬

[২] মুসলিম: ৩৮৪, তিরমিযি: ৩৬১৪, নাসায়ী: ৬৭৮, আবু দাউদ: ৫২৩, আহমাদ: ৬৫৬৩

পরপর আসবে পরবর্তী শিঙ্গাধ্বনি। মৃত্যু তার ভয়াবহতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, মৃত্যু তার ভয়াবহতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

উবাই রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমি তো খুব অধিক হারে আপনার প্রতি দুরূদ পাঠ করি। আপনার প্রতি দুরূদ পাঠের জন্য আমি আমার সময়ের কতটুকু খরচ করবো? তিনি বললেন, তুমি যতক্ষণ ইচ্ছা করো। আমি বললাম, এক-চতুর্থাংশ সময়? তিনি বললেন, তুমি যতটুকু ইচ্ছা করো, তবে এর চেয়ে অধিক পরিমাণে পাঠ করতে পারলে এতে তোমারই মঙ্গল হবে। আমি বললাম, তাহলে আমি কি অর্ধেক সময় দুরূদ পাঠ করবো? তিনি বললেন, তুমি যতক্ষণ চাও, যদি এর চেয়েও বাড়াতে পারো সেটা তোমার জন্যই কল্যাণকর। আমি বললাম, তাহলে দুই-তৃতীয়াংশ সময় দুরূদ পাঠ করবো? তিনি বললেন, তুমি যতক্ষণ ইচ্ছা করো, তবে এর চেয়েও বাড়াতে পারলে তোমারই ভালো। আমি বললাম, তাহলে আমার পুরো সময়টাই আপনার দুরূদ পাঠে কাটিয়ে দিব? তিনি বললেন—তোমার চিন্তা ও কষ্টের জন্য তা যথেষ্ট হবে এবং তোমার পাপসমূহ ক্ষমা করা হবে।[১]

নবিজীকে ভালোবাসার কত আওয়াজ তো আজকাল আমরা মুখে উচ্চারণ করি, কত শ্লোগান ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে দেখি হররোজ আমাদের চারপাশে। কতোটা ভালোবাসি তা আল্লাহ তায়ালার কাছে নিশ্চয়ই গোপন নয়!

[১] তিরমিযী: ২৪৫৭, আহমাদ: ২১২৪২

স্মারক

তোমরা কবর যিয়ারত করতে যাও। কারণ কবর আখিরাতের কথা মনে করিয়ে দেয়। বলেছেন নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

কবর কী সত্যিই আখেরাতের কথা মনে করিয়ে দেয়!

আমি প্রায় কবরস্থানে যাই। এই সেদিনও দেখলাম—কবরের 'পরে বসে কজন তরুন নেশা করছে। আরেকবার দেখলাম নির্জন কবরগাহে নিশ্চিন্তে জুয়ার আসর বসিয়েছে একদল মধ্যবয়সী পুরুষ। এই তো গতকালের কথা—কবরের পাশেই যে খেলার মাঠ। সেখানে একা এক নিরীহ যুবককে পিটিয়ে রক্তাক্ত করে রেখে গেল তারই একদল সহচর। আমাদের খুলনা বসুপাড়ার গোরস্থানে বহু আগে ধর্ষণের মতো দুর্ঘটনাও একবার ঘটেছিলো। কত মানুষ রোজ হেটে যায় দিনাজপুরের লালবাগ কবরস্থানের মধ্যখানের রাস্তাটা দিয়ে। হেঁটে যেতে যেতে তারা সুদের অঙ্ক কষে। কার জমিতে কতটুকু আল ঠেলবে সেই পরিকল্পনা আঁটে।

তবে যে নবিজী বললেন—কবর আখেরাতকে মনে করিয়ে দেয়! আখেরাতের কথা মনে পড়লে কি আর উপরোক্ত ঘটনাগুলো ঘটবার কথা! বলুন!

নবিজীর কথা শতভাগ সত্য। নিঃসন্দেহে কবর আখেরাতকে মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু আমার যে আখেরাতের কথা মনে পড়বে তার আগে আখেরাত কী—সেটা তো আমার জানা থাকতে হবে! আখিরাতের রূপ-চিত্র আমার স্মৃতিতে তো হাজির থাকতে হবে!

একটু সহজ করে বলি।

ধরা যাক রিফাত-রাতুল মানিকজোড়। সারাক্ষণ তারা একই সাথে থাকে। তাদের দুজনকে বহুবার দেখেছি আমি একসঙ্গে। তাদের দুজনের মুখই আমার চেনা এবং তাদের বৈশিষ্ট্য আমার জানা। এখন যে কোনো সময় আমার সামনে তাদের যে কোনো একজনের উপস্থিতি আমাকে অপরজনের কথা মনে করিয়ে দেবে। তাদের সম্পর্কের কথা এত গভীরভাবেই আমি জানি যে, একজনকে দেখা মাত্র অপরজন স্মৃতিতে হাজির হবেই।

এইখানেই হলো দূরত্বটা। কবর দেখেই আখেরাত যে আমার মনে পড়বে কিন্তু আখেরাত কী! কবরের সাথে তার কিইবা সম্পর্ক! এসব আমার অজানা। আখেরাতের

কোনো ধারনাই তো আমার মনে চিত্রিত নেই। তাহলে তার কথা মনে পড়বে কিভাবে! যে কারণে কবর তো দেখি প্রতিদিন বহুবার। কিন্তু কবর দেখে আমার চিন্তায় আখেরাত হাজির হয় না। যার কোনো চিত্রই আমার মানসপটে অঙ্কিত নেই তার রূপ কিভাবে হাজির হবে আমার চোখের সমুখে! কিভাবে!

আরেক হলো—কবর দেখে আখেরাতের কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে মৃত্যুর কথা। কিন্তু কোনো ভয় জাগে না।

এই ব্যাপারটার বিশ্লেষণেও একটা উদাহরণ টানা যাক—নুরু মিঞার গাছে ঢিল মেরে আমি আম পাড়ছি। জনৈক পথচারী আমাকে সংবাদ দিলো যে, নুরু মিঞা এদিকে আসছে। পালাও।

এখন লোকটির সতর্ককারী উচ্চারণ শোনা মাত্রই নুরু মিঞার একটা ছবি তো আমার মুখের সামনে ভেসে উঠেছে। কিন্তু তার প্রতি যদি আমার ভয় না থাকে! আমি বিরত হবো না। মনে মনে ভাববো—ধুর, নুরু মিঞা আবার কী করবে? সে আসলে আসুক। তারে ডরাই নাকি আমি!

আর যদি নুরু মিঞার ভয় আমার মনে প্রোথিত থাকে! নুরু মিঞার আগমনের সংবাদ শোনার পর গাছ তলাতে আমাকে কি আর খুঁজে পাওয়া যাবে? আর তার প্রতি ভয়ের মাত্রা যদি আরেকটু বেশি হয়! তবে তো কোনোদিন তার গাছ তলাতে যাওয়ারই সাহস হবে না আমার।

আখেরাতের প্রতি ভয়টা এমনই। আখেরাতের প্রতি যার যতো ভয়, কবর তার হৃদয়ে ততো গভীর প্রভাব ছড়িয়ে দেয়। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর প্রতি যার ভয় যতো বেশি সে তোমাদের মধ্যে ততোধিক সম্মানিত।[১]

আসলে তাকওয়া বা আল্লাহভীতিটাই হলো মূল কথা। হৃদয়ে আল্লাহর ভয় না থাকলে কোনো কিছুই সেভাবে প্রভাব সৃষ্টি করে না। সেজন্য হৃদয়কে প্রথমে প্রস্তুত করতে হবে তাকওয়ার মাধ্যমে; অন্তরে বদ্ধমূল করে নিতে হবে আল্লাহর ভয়। তাহলেই আমাদের জন্য সব অন্যায় অপরাধ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে। ভয়ডরহীন আত্মা কিভাবে বেঁচে থাকবে অন্যায় পাপ অপরাধ থেকে? কিভাবে?

[১] সূরা হুজুরাত, আয়াত: ১৩

হক-না হকের ফিরিস্তি

সারা পৃথিবী জুড়ে আজ অধিকার আদায়ের মিছিল। প্রত্যেকে ঘরে কি বাইরে, শ্লোগানে মুখর হয়ে কি নীরবে নিজের অধিকার নিয়ে উচ্চকিত। কি মুসলিম আর কি অমুসলিম। সকলের কণ্ঠেই এক সুর: আমার অধিকার আমাকে ফিরিয়ে দাও।

সমস্যা হলো—ইসলাম নারীকে যতটুকু অধিকার দিয়েছে আমরা তাকে আজ ততটুকুও দিচ্ছি না। ইসলাম প্রদত্ত তার হক ও অধিকারটুকুও তাকে দিতে আজ আমরা নারাজ। বাবার সম্পত্তিতে বোনের শরীয়তসম্মত যে হিস্যা সেটা ভাই তাকে দিচ্ছে না। ভাই হিসাবে বোনের প্রতি যে দায়িত্ব সেটুকু সে পালন করছে না। স্বামীর ওপর স্ত্রীর যতটুকু হক রয়েছে নানান দোহাই দিয়ে সে তা আদায় করছে না। দেনমোহর নিয়ে যে সমাজে কী হয়! মানুষকে দেখানোর জন্য, আত্মপ্রসাদে ডুবে যাওয়ার জন্য লক্ষ টাকা দেনমোহর ধার্য করা হয়। অথচ স্ত্রীকে তা শোধ করা হয় না। অনেকের কথা জানি—ভরণপোষণকেই দেনমোহর হিসাবে বলে থাকে। বলে—সারাজীবন খাওয়াচ্ছি। আবার দেনমোহর কীসের!

অনেক স্বামী তার স্ত্রীর সাথে হেসে কথা পর্যন্ত বলে না। পর্দার দোহাই দিয়ে স্ত্রীকে কোনোদিন বাড়ির বাইরে ঘুরতে পর্যন্ত নিয়ে যায় না। গতরাতে আমার এক বন্ধুর কথা জানলাম। সে ইসলাম পালন করে। মানে, মুখের দাড়ি, গায়ের পোশাক আর মাথার টুপি থেকে তেমনই মনে হবে আপনার। কিন্তু তার ব্যাপারে জানতে পারলাম সে প্রায় রাতেই তার স্ত্রীর গায়ে হাত তোলে। স্ত্রী যদি অপরাধ করে শরীয়ত সম্মত পদ্ধতি আছে তার প্রতিকারের। গায়ে হাত তোলার প্রয়োজন হলে তার সীমানাও শরীয়ত নির্ধারণ করে দিয়েছে। কিন্তু কে আজ সেসবের ধার ধারে! শরীয়া বলতে আমরা আজকাল মনে করি—মসজিদে গিয়ে তিন ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা।

দীন ও ইসলাম সম্বন্ধে চারপাশে কেবল অসম্পূর্ণ ধারণা ও অপূর্ণাঙ্গতা দেখি। আর আমাদের দীন পালনের অপূর্ণাঙ্গতা থেকেই জন্ম নিচ্ছে নানা মতবাদের।

শরীয়ত কন্যা-জায়া-জননীকে যতটুকু অধিকার দিয়েছে আমি তাদেরকে ততটুকু বুঝিয়ে দিচ্ছি না। ফলে নারীবাদীরা আমাদের নিয়ে মুখ খোলার সাহস দেখাচ্ছে। ইসলাম একজন মানুষকে, চাই সে যে ধর্মেরই হোক, যতটুকু অধিকার দিয়েছে তা

আমি আজ প্রদান করছি না বলেই একদল মানুষ ইসলাম বাদ দিয়ে 'মানবধর্মের' আওয়াজকে উচ্চকিত করবার সুযোগ পাচ্ছে।

আসলে সব নষ্টের গোড়া আমার দীন পালনে অপূর্ণাঙ্গতা। আমার পালিত আংশিক দীন দেখেই মানুষ এটাকে দীনের ত্রুটি বলে ভেবে নিচ্ছে। আমিও অন্যের হক মেরে ভাবতে পারছি যে আমি দীনদার।

এমন হলে চূড়ান্ত সাফল্য আসবে না। চূড়ান্ত সফলতার জন্য পরিপূর্ণভাবে দীনে প্রবেশ করতে হবে। যার যতটুকু হক শরীয়ত আমার ওপর অপরিহার্য করেছে তার ততটুকু হক তার কাছে আমাকে পৌঁছে দিতে হবে। যার সাথে যেমন আচরণ শরীয়ত আমাকে করতে বলেছে তার সাথে তেমন আচরণ আমাকে করে দেখাতে হবে। দীনে প্রবেশ করতে হবে পরিপূর্ণভাবে। আল্লাহ তায়ালা বলছেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইসলামে প্রবেশ করো পরিপূর্ণভাবে।[১]

আমাকে মনে রাখতে হবে—যে কোন বিষয়ের সফলতা তার পূর্ণতা সাধনের মধ্যেই। আংশিক কোনো কাজে সাফল্য আসে না, আসবে না।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করার তাওফিক দিন।

[১] সূরা বাকারা, আয়াত: ২০৮

ঝরে যায় বকুলের ঘ্রাণ

সংবাদটা দেখি এক রাতে। রাজধানীর উত্তরখানে কতিপয় কিশোরের ছুরিকাঘাতে সোহাগ নামের অপর এক কিশোর খুন।

এমন খুনোখুনির ঘটনা তো দেশে এখন প্রতিদিনকার চিত্র হয়ে উঠেছে। তবে এই ঘটনাটি আমাকে বিশেষ প্রভাবিত করে। একদমই হতবিহ্বল হয়ে পড়ি আমি ঘটনাটির বিস্তার জানতে পেরে।

আপনাদের কারোর গোচরে এসেছিলো কিনা সেদিনের ঘটনাটি! নির্দিষ্ট করে সেই ঘটনাটি না জানলেও বিশেষ ক্ষতি কিছু নেই। আমি যা বলতে চাচ্ছি তা বুঝে উঠতে ঘটনাটি উদাহরণ হিসাবে হাজির করছি কেবল। নতুবা এমন ঘটনা তো প্রত্যহই আমাদের চারপাশে ঘটে থাকে। কি রাজধানী আর কি শহরতলী! এমনটা ঘটছে সর্বত্র; আমাদেরই চোখের সামনে।

যেদিনের কথা বলছি সেদিন সন্ধ্যারাতে একদল কিশোর রাস্তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। তখন বর্ষার মওসুম। ঢাকার রাস্তা ঘাটের কী অবস্থা হতে পারে তা তো আর আপনাদের কাছে গোপন নয়। তো, কিশোর দল যখন হেঁটে যাচ্ছিলো তখন তাদের বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ইজি বাইক কর্দমাক্ত পানি ছিটিয়ে দেয় তাদের দিকে। তাদের প্যান্টের নিচের অংশ রাস্তায় জমে থাকা ময়লা পানিতে নোংরা হয়ে যায়। এমন বর্ষাদিনে ঢাকার রাস্তায় চলতে ফিরতে এ এক স্বাভাবিক ঘটনা।

কিন্তু আফসোস যেটা—ঘটনাটিকে কিশোর দল স্বাভাবিকভাবে নেয় না। এভাবে পানি ছিটিয়ে নোংরা করে দেবার অপরাধে (!) অটো চালককে তারা মারধর করতে শুরু করে। তাদের এমন দুঃসাহস দেখে তাদেরই বয়সী সোহাগ এগিয়ে আসে প্রবীণ অটো চালককে তাদের হাত থেকে উদ্ধারের জন্য। আর সেটাই সোহাগের জন্য, সোহাগের পরিবারের জন্য দুঃস্বপ্ন হয়ে নেমে আসে।

উত্তপ্ত কিশোর দল ছুরি বের করে চালিয়ে দেয় সোহাগের পেট বরাবর। সাথে সাথেই তার নাড়িভুড়ি সব বের হয়ে আসে। হসপিটাল পর্যন্ত-ও তাকে আর নেয়া যায় না।

পুলিশ অপরাধীদের চিহ্নিত করেছে। সবাইকে শাস্তির আওতায় আনা হবে বলে ঘোষণাও দিয়েছেন সে এলাকার নির্বাহী। কিন্তু যে ক্ষতি হয়ে গেলো সোহাগের পরিবারের তার পূরণ কি আর হবে!

২.

ঘটনাটির বিশ্লেষণে গেলে আমরা দেখতে পাবো—সব কিছুর মূলে রয়েছে অসহিষ্ণুতা, অধৈর্য; আর রয়েছে ক্ষমতা প্রকাশের নগ্ন তাড়না।

একটু পানিই তো লেগেছে গায়ে। সেজন্য এমন উদ্ধত হতে হবে আমাকে? একজন প্রবীণ অটো চালকের গায়ে পর্যন্ত হাত দিয়ে বসবো আমি! আমার এমন দুঃসাহস জন্মেছে, কারণ, আমার সাথে আমার চারজন বন্ধু আছে। পকেটে একটি ধারালো ছুরি আছে।

কিন্তু একটু ভাবা দরকার—বর্তমান সময়ের কিশোরেরা এমন অসহিষ্ণু হয়ে পড়লো কেন? কারোর মধ্যে হার মানার ইচ্ছে নেই। একজন আমাকে ধাক্কা দিয়ে গেলো। তাকে ক্ষমা করে দেবো—এমন মানসিকতা বর্তমান সময়ের কিশোরদের নেই বললেই চলে। তারা সব জায়গায় একটা নায়কোচিত মুড নিয়ে চলাফেরা করতে পছন্দ করে। সিনেমা,নাটক,থিয়েটারে যেমন দেখে প্রত্যহ তেমন একটা পরিবেশ তৈরিতে তারা সারাক্ষণ ভাবিত থাকে। তিন-চারজন বন্ধু মিলে গ্যাং তৈরি করে। আর এই গ্যাং যখন হেঁটে যায় রাস্তা দিয়ে চারপাশের অন্য সবকিছু এবং অন্য সবাই তখন তুচ্ছ, অতি নগণ্য হয়ে ওঠে তাদের চোখে।

ভালোবাসা, হৃদ্যতা, উদারতা ও ক্ষমা করার মহত্ব বিবর্জিত এক প্রজন্ম বেড়ে উঠছে আমাদের চারপাশে।

৩.

আবার সোহাগের মতো গুটিকয় কিশোরও কিন্তু আমাদের সমাজে আছে। যারা অচেনা কাউকে প্রহৃত হতে দেখলে এগিয়ে যায়। অন্যের বিপদে নিজেকে ঝুঁকিতে ফেলতেও দ্বিতীয়বার ভাবে না।

সোহাগের প্রোফাইল ঘাটলেও আপনি বর্তমান সময়ের কিশোরদের সমস্যা নিরসনের উপায় পেয়ে যাবেন।

সোহাগের পরিবার বলছে—সে পরিবারের লোকদের সাথে অনেক সময় দিত। বাইরে কারোর সাথে তেমন মেলামেশা করতো না। সারাদিন পড়াশোনা নিয়েই থাকতো। এলাকার ইমাম সাহেব জানাচ্ছেন—সোহাগ নিয়মিত তাবলীগের কাজের সাথে যুক্ত

থাকতো। মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করতো। অবসর পেলেই বসতো গিয়ে ইমাম সাহেবের রুমে। তার সাথে সম্পর্ক রেখে চলতো। পরামর্শ করতো মসজিদের ইমাম মুয়াজ্জিন এবং দীনদার ব্যক্তিদের সাথে। সেই প্রথম কোনো মুয়াজ্জিনকে কাঁদতে দেখেছিলাম এলাকার বাহ্যত অনাত্মীয় এক কিশোরের মৃত্যুতে। সাংবাদিকের সাথে কথা বলার সময় অঝোর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিলো মুয়াজ্জিন সাহেবের দু চোখ বেয়ে। নিজেকে সামলিয়ে তিনি কথাও বলতে পারছিলেন না ঠিকঠাক।

এখন একটু তলিয়ে দেখলে সোহাগের চরিত্রে আমরা প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাই:

১) পরিবারে সময় দেয়া।

২) ইমাম মুয়াজ্জিন ও দীনদার ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক রেখে চলা। এবং

৩) দীনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ লালন করা।

বর্তমান সময়ের কিশোরেরা যে গুণ তিনটি থেকে ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছে।

এখন অভিভাবক হিসাবে আমাদের কর্তব্য কী? আমাদের কর্তব্য হলো—আমাদের সন্তান পরিবারে কতটুকু সময় অতিবাহিত করছে তার প্রতি লক্ষ রাখা। দীনদার ব্যক্তিদের সাথে তার সম্পর্ক তৈরি করে দেয়া। আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সৎকর্মশীলদের সাথী হতে। আমরা নিজেরাও সৎকর্মশীলদের বন্ধু হবো। সন্তানদের সম্পর্কও তৈরি করে দেবো সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠদের সাথে। সন্তান যদি দীনদার ব্যক্তিদের সাথে চলাফেরা করে তাহলে তার মধ্যে দীনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগরূক হবেই।

এই অস্থির সময়ে আমাদের কিশোর ও তরুণদের রক্ষা করার জন্য দীনের বিকল্প নাই।